গল্প

বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

BENGALIEBOOK.COM 2021

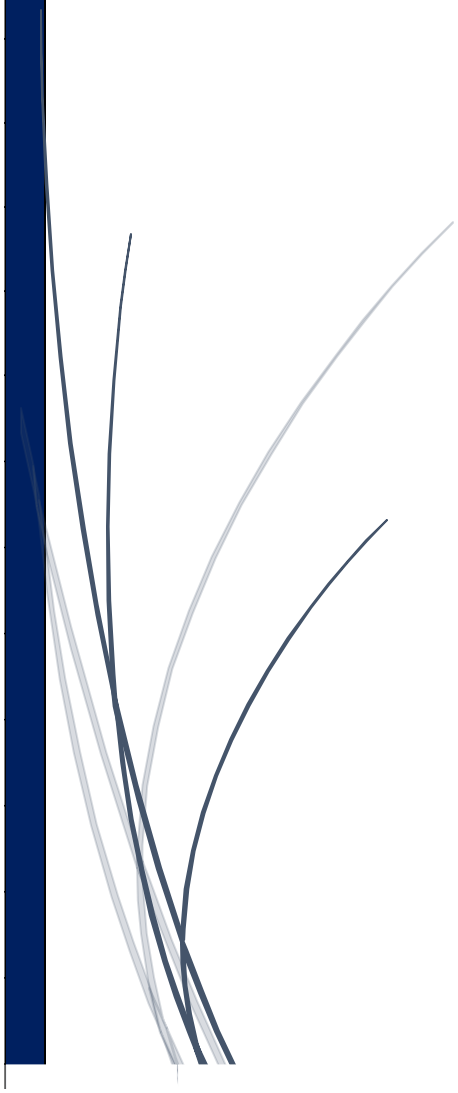

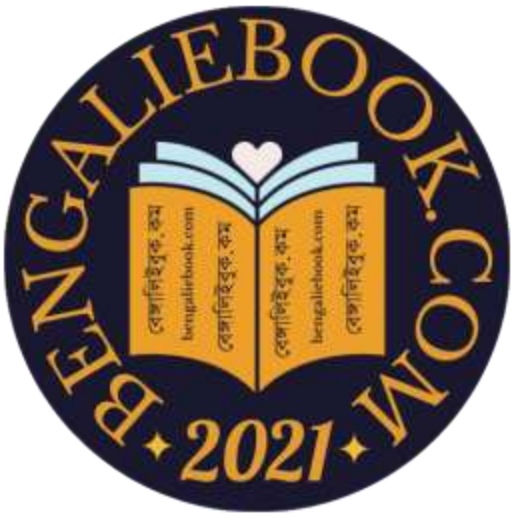

বছর-পঞ্চাশ পূর্বের একটা দিনের কাহিনী

ঠ্যাঙাড়ের কথা শুনেছে অনেকে এবং আমাদের মতো যারা বুড়ো তারা দেখেচেও অনেকে। পঞ্চাশ-ষাট বছর আগেও পশ্চিম বাঙলায়, অর্থাৎ হুগলী বর্ধমান প্রভৃতি জেলায় এদের উপদ্রব ছিল খুব বেশী। তারও আগে, অর্থাৎ ঠাকুরমাদের যুগে, শুনেছি, লোক-চলাচলের প্রায় কোন পথই সন্ধ্যার পরে পথিকের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। এই দুর্বৃত্তরা ছিল যেমন লোভী তেমনি নির্দয়। দল বেঁধে পথের ধারে ঝোপঝাড়ে লুকিয়ে থাকতো, হাতে থাকতো বড় বড় লাঠি এবং কাঁচা বাঁশের ভারী ছোট ছোট খেঁটে, তাকে বলতো পাব্‌ড়া। পথিক চলে গেলে তার পা লক্ষ্য করে পিছন থেকে ছুঁড়ে মারতো সেই পাব্‌ড়া। অব্যর্থ তার সন্ধান। অতর্কিতে পায়ে চোট খেয়ে সে যখন পথের উপর মুখ থুবড়ে পড়তো, তখন সকলে ছুটে এসে দুম্‌দাম করে লাঠি মেরে তার জীবন শেষ করতো। এর ভাবা-চিন্তা বাছবিচার নেই! এদের হাতে প্রাণ দিয়েছে এমন অনেক লোককে আমি নিজের চোখেই দেখেচি।

ছেলেবেলায় আমার মাছধরার বাতিক ছিল খুব বেশী। অবশ্য মস্ত ব্যাপার নয়,—পুঁটি, চ্যালা প্রভৃতি ছোট ছোট মাছ। ভোর না হতেই ছিপ-হাতে নদীতে গিয়ে হাজির

হতাম। আমাদের গ্রামের প্রান্তে হাজা মজা ক্ষুদ্র নদী, কোথাও কোমরের বেশি জল নেই, সমস্তই শৈবালে সমাচ্ছন্ন—তার মাঝে মাঝে যেখানে একটু ফাঁক সেখানেই এই সব ছোট ছোট মাছ খেলা করে বেড়াত। বঁড়শিতে টোপ গেঁথে সেইগুলি ধরার ছিল আমার বড় আনন্দ। একলা নদীর তীরে মাছের সন্ধানে ঘুরতে ঘুরতে কতদিন দেখেচি কাদায় শ্যাওলায় মাখামাখি মানুষের মৃতদেহ। কোনটার মাথা থেকে হয়তো তখনও রক্ত ঝরে জলটা রাঙ্গা হয়ে আছে। নদীর দুই তীরেই ঘন বনজঙ্গল, কি জানি কোথাকার মানুষ, কোথা থেকে ঠ্যাঙাড়েরা মেরে এনে এই জনবিরল নদীর পাঁকে পুঁতে দিত।

এর জন্য কখনো দেখিনি পুলিশ আসতে, কখনো দেখিনি গ্রামের কেউ গিয়ে থানায় খবর দিয়ে এসেছে। এ ঝঞ্ঝাট কে করে! তারা চিরদিন শুনে আসছে পুলিশ ঘাঁটাতে নেই,—তার ত্রিসীমানার মধ্যে যাওয়াও বিপজ্জনক। বাঘের মুখে পড়েও দৈবাৎ বাঁচা যায়, কিন্তু ওদের হাতে কদাচ নয়। কাজেই এ দৃশ্য কারও চোখে পড়তো, সে চোখ ফিরিয়া নিঃশব্দে অন্যত্র সরে যেত। তারপরে রাত্রি এলে, শিয়ালের দল বেরিয়ে মহা-সমারোহে ভোজানাদি শেষ করে নদীর জলে আঁচিয়ে মুখ ধুয়ে ঘরে ফিরে যেত—মড়ার চিহ্নমাত্র থাকত না।

একদিন আমার নিজেরও হয়তো ঐ দশা ঘটত কিন্তু ঘটতে পেলে না। সেই গল্পটা বলি।

আমার বয়েস তখন বছর বারো। সকালে ছুটির দিনে ঘরের মধ্যে লুকিয়ে বসে ঘুড়ি তৈরি করচি, কানে গেল ও-পাড়ার নয়ন বাগদীর গলা। সে আমার ঠাকুরমাকে বলচে, গোটাপাঁচেক টাকা দাওনা দিদিঠাকরুন, তোমার নাতিকে দুধ খাইয়ে শোধ দেব।

ঠাকুরমা নয়নচাঁদকে বড় ভালবাসতেন, জিজ্ঞেসা করলেন, হঠাৎ টাকার কি দরকার হলো নয়ন?

সে বললে, একটি ভাল গরু আনব, দিদি। বসন্তপুরে পিসীমার বাড়ি, পিসতুত ভাই বলে পাঠিয়েছে, চার-পাঁচটি গরু সে রাখতে পারচে না, আমাকে একটি দেবে। কিছু নেবে না জানি, তবু গোটা-পাঁচেক টাকা সঙ্গে রাখা ভালো।

ঠাকুরমা আর কিছু না বলে পাঁচটা টাকা এনে তার হাতে দিলেন, সে প্রণাম করে চলে গেল।

আমি শুনেছিলাম বসন্তপুরে ভাল ছিপ পাওয়া যায়, সুতরাং নিঃশব্দে তার সঙ্গ নিলাম। মাইল-দুই কাঁচা পথ পেরিয়ে গ্রান্ড ট্রাঙ্ক রোড ধরে বসন্তপুরে যেতে হয়। মাইল-খানেক গিয়ে কি জানি কেন হঠাৎ পিছনে চেয়ে নয়ন দেখে আমি। ভয়ানক রাগ করলে, বললে আমার জন্য সে দশখানা ছিপ কেটে আনবে, তবু কোনমতে আমি ফিরে যেতে রাজী হলাম না। অনেক কাকুতি-মিনতি করলাম, কিন্তু সে শুনলে না। আমাকে ধরে জোর করে বাড়িতে ফিরিয়ে নিয়ে এল। কান্নাকাটিতে ঠাকুরমা একটু নরম হলেন, কিন্তু নয়নচাঁদ কিছুতে সম্মত হলো না। বললে, দিদি, যেতে-আসতে কোশ-আষ্টেক পথ বৈ নয়, জোছনা রাত—স্বচ্ছন্দে নিয়ে যেতে পারতাম, কিন্তু পথটা ভালো নয়, ভয় আছে। বেলাবেলি যদি ফিরতে না পারি, তখন একলা গরু সামলাবো, না ছেলে সামলাবো, না নিজেকে সামলাবো—কি করব বল ত, দিদি।

পথে ভয়টা যে কি তা এ অঞ্চলের সবাই জানে। ঠাকুরমা একেবারে বেঁকে দাঁড়ালেন, বললেন, না, কখনো না। যদি পালিয়ে যাস, তোর ইস্কুলের মাস্টারমশাইকে চিঠি লিখে পাঠাবো, তিনি পঞ্চাশ ঘা বেত দেবেন।

নিরুপায় হয়ে আমি তখন অন্য ফন্দি আঁটলাম। নয়ন চলে গেলে, পুকুরে নেয়ে আসি বলে তেল মেখে গামছা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। নদীর ধারে ধারে বনজঙ্গল ও আম-কাঁঠাল বাগানের ভিতর দিয়ে মাইল দুই-আড়াই ছুটতে ছুটতে যেখানটায় আমাদের কাঁচা রাস্তা এসে পাকা রাস্তায় মিলেছে সেইখানটায় এসে দাঁড়িয়ে রইলাম। মিনিট-দশেক পরে

দেখি নয়ন আসচে। সে আমাকে দেখে প্রথমটা খুব বকলে, তারপর আমি কি করে এসেছি শুনে হেসে ফেললে। বললে, চলো ঠাকুর, যা অদৃষ্টে আছে তাই হবে। এতদূর এসে আর ত ফিরতে পারিনে।

নয়নদা সাতগাঁর একটা দোকান থেকে মুড়ি-মুড়কি-বাতাসা কিনে আমার কোঁচার খুঁটে বেঁধে দিলে, খেতে খেতে প্রায় দুপুরবেলা দু'জনে বসন্তপুরে এসে ওর পিসীর বাড়িতে পৌঁছলাম। পিসীর অবস্থা সচ্ছল। বাড়ির নীচেই কুন্তী নদী; ছোট, কিন্তু জল আছে, জোয়ার-ভাটা খেলে। স্নান করে এলাম, ওদের বড়বৌ কলাপাতায় চিঁড়ে গুড় দুধ কলা দিয়ে ফলারের যোগাড় করে দিলে। খাওয়া হলে নয়নের পিসী বললে, ছেলেমানুষ, চার-পাঁচ কোশ পথ হেঁটে এসেছে, আবার যেতে হবে। এখন শুয়ে একটু ঘুমুক তার পরে বেলা পড়লে যাবে। তার ছোট ছেলে ছিপ কেটে আনতে গেল।

নয়ন আর আমি দু' জনেই পথ হেঁটে এমনি ক্লান্ত হয়েছিলাম যে আমাদের ঘুম যখন ভাঙ্গলো তখন চারটে বেজে গেছে। বেলার দিকে চেয়ে নয়নদা একটু চিন্তিত হলো, কিন্তু মুখে কিছু বললে না। মিনিট-দশেকের মধ্যেই আমরা বেরিয়ে পড়লাম। যাবার সময় সে প্রণামী বলে পিসীকে টাকা-পাঁচটা দিতে গেল; কিন্তু তিনি নিলেন না, ফিরিয়ে দিলেন। বললেন, তোর ছেলেমেয়েদের বাতাসা কিনে দিস।

আমার কাঁধে ছিপের তাড়া, নয়নের বাঁ হাতে গরুর দড়ি, ডান হাতে চার হাত লম্বা বাঁশের লাঠি। কিন্তু গরু নিয়ে দ্রুত চলা যায় না, কোশ-দুই না যেতেই সন্ধ্যা উতরে আকাশে চাঁদ দেখা দিলে। রাস্তার দু'ধারেই বড় বড় অশ্বত্থ, বট আর পাকুড় গাছ ডালে ডালে মাথায় মাথায় ঠেকে এক হয়ে আছে। পথ অন্ধকার, শুধু কেবল পাতার ফাঁকে ফাঁকে জোছনার ম্লান আলো স্থানে স্থানে পথের উপর এসে পড়েছে। নয়ন বললে, দাদাভাই, তুমি আমার বাঁ দিকে এসে তোমার বাঁ হাতে গরুর দড়িটা ধরো, আমি থাকি তোমার ডাইনে।

কেন নয়নদা?

না, এমনি। চলো যাই।

আমি ছেলেমানুষ হলেও বুঝতে পারলাম নয়নদার কণ্ঠস্বরে উদ্বেগ পরিপূর্ণ।

ক্রমশঃ, পাকা রাস্তা ছেড়ে আমরা কাঁচা রাস্তায় এসে পড়লাম। দু'পাশের বনজঙ্গল আরও ঘন হয়ে এলো, বহু প্রাচীন সুবৃহৎ পাকুড় গাছের সারি মাথার উপরে পাতার অবিচ্ছিন্ন আবরণে কোথাও ফাঁক রাখেনি যে একটু চাঁদের আলো পড়ে। সন্ধ্যায় কৃষাণ-বালকেরা এই পথে গরুর পাল বাড়ি নিয়ে গেছে, তাদের খুরের ধুলো এখনও নাকেমুখে ঢুকছে, এমনি সময়ে সুমুখে হাত পঞ্চাশ-ষাট দূরে বিদীর্ণ কণ্ঠের ডাক এলো বাবা গো, মেরে ফেললে গো। কে কোথায় আছো রক্ষে করো! সঙ্গে সঙ্গে লাঠির ধুপধাপ দুমদাম শব্দ। তার পরে সমস্ত নীরব।

নয়নদা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে বললে, যাঃ—শেষ হয়ে গেল।

কি শেষ হলো নয়নদা?

একটা মানুষ। বলে কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে সে কি ভাবলে, তার পরে বললে, চলো দাদাভাই, আমরা একটু সাবধানে যাই।

গরু বাঁয়ে, নয়নদা ডাইনে, আমি উভয়ের মাঝখানে। ছেলেবেলা থেকে শুনে আসচি, দেখেও আসচি মাঝে মাঝে, সুতরাং বালক হলেও বুঝলাম সমস্ত। "কে কোথায় আছো রক্ষে করো!" তখনও দু'কানে বাজচে—ভয়ে ভয়ে বললাম, নয়নদা ওরা যে সব সামনে দাঁড়িয়ে, আমরা যাবো কি করে? মারে যদি—

না, দাদাভাই, আমি থাকতে মারবে না। ওরা ঠ্যাঙাড়ে কিনা—আমাদের দেখলেই পালাবে। ওরা ভারী ভীতু।

গরু, আমি ও নয়নচাঁদ তিনজনে ধীরে ধীরে এগোতে লাগলাম। ভয়ে আমার পা কাঁপচে—নিশ্বাস ফেলতে পারিনে এমনি অবস্থা। গাছের ছায়া আর ধুলোর আঁধারে এতক্ষণ দেখা যায়নি কিছুই, পনেরো-বিশ হাত এগিয়ে আসতেই চোখে পড়লো জন পাঁচ-ছয় লোক যেন ছুটে গিয়ে পাকুড় গাছের আড়ালে লুকোলো। নয়নদা হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে হাঁক দিলে—সে কি ভয়ানক গলা—বললে, খবরদার বলচি তোদের। বামুনের ছেলে সঙ্গে আছে—পাব্‌ড়া ছুঁড়ে মারলে তোদের একটাকেও জ্যান্ত রাখবো না—এই সাবধান করে দিলাম।

কেউ জবাব দিলে না। আমরা আরো খানিকটা এগিয়ে এসে দেখি একটা লোক উপুড় হয়ে রাস্তার ধুলোয় পড়ে। অল্প-স্বল্প চাঁদের আলো তার গায়ে লেগেছে,—নয়নদা ঝুঁকে দেখে হায় হায় করে উঠলো! তার নাক দিয়ে কান দিয়ে মুখ দিয়ে রক্ত ঝরে পড়চে, শুধু পা দুটো তখনও থরথর করে কাঁপচে! কাঁধের ভিক্ষের ঝুলিটি তখনও কাঁধে, কিন্তু চালগুলি ছড়িয়ে পড়েচে ধুলোয়। হাতের একতারাটি লাঠির ঘায়ে ভেঙ্গেচুরে খানিকটা দূরে ছিটকে পড়ে আছে।

নয়নদা সোজা হয়ে উঠে দাঁড়ালো, বললে, ওরে নারকী, নরকের কীট। তোরা মিছিমিছি একজন বৈষ্ণবের প্রাণ নিলি? এ তোরা করেছিস কি! তার ক্ষণেক পূর্বে ভীষণ কণ্ঠ সহসা যেন বেদনায় ভরে গেল।

কিন্তু ওদিক থেকে সাড়া এল না। নয়নের এ দুঃখের প্রধান হেতু সে নিজে পরম বৈষ্ণব। তার গলায় মোটা মোটা তুলসীর মালা, নাকে তিলক, সর্বাঙ্গে নানাবিধ ছাপছোপ। বাড়িতে তার একটি ছোট ঠাকুরঘর আছে, সেখানে মহাপ্রভুর শ্রীপট প্রতিষ্ঠিত। সহস্রবার ইষ্টনাম জপ না করে সে জলগ্রহণ করে না। ছেলেবেলায় পাঠশালায় বর্ণ-পরিচয় হয়েছিল,

এখন নিজের চেষ্টায় বড় অক্ষরে ছাপা বই অনায়াসে পড়তে পারে। প্রদীপের আলোকে ঠাকুরঘরে বসে বটতলার প্রকাশিত বৈষ্ণব ধর্মগ্রন্থ প্রত্যহ অনেক রাত্রি পর্যন্ত সে সুর করে পড়ে। মাংস সে খায় না, সঙ্কল্প আছে, ভবিষ্যতে একদিন মাছ পর্যন্ত ছেড়ে দেবে।

তার বৈষ্ণব হবার ছোট্ট একটু ইতিহাস আছে, এখানে সেটুকু বলে রাখি। এখন তার বয়স চল্লিশের কাছে, কিন্তু যখন পঁচিশ-ত্রিশ ছিল, তখন ডাকাতির মামলায় জড়িয়ে সে একবার বছর-খানেক হাজত-বাস করে। ঠাকুরমার এক পিসতুতো ভাই ছিলেন জেলার বড় উকিল, তাঁকে দিয়ে বহু তদ্বির ও অর্থব্যয় করে ঠাকুরমা ওকে খালাস করেন। হাজত থেকে বেরিয়েই সে সোজা নবদ্বীপ চলে যায় এবং তথায় কোন এক গোস্বামীর কাছে দীক্ষা নিয়ে, মাথা মুড়িয়ে, তুলসীর মালা ধারণ করে সে দেশে ফিরে আসে। সেদিন থেকে সে গোঁড়া বৈষ্ণব। নয়ন যখন-তখন এসে আমার ঠাকুরমাকে ভূমিষ্ট প্রণাম করে যেত। ব্রাহ্মণের বিধবা স্পর্শ করার অধিকার নেই, যে-কোন একটি গাছের পাতা ছিঁড়ে তাঁর পায়ের কাছে রাখত, তিনি পায়ের বুড়ো আঙুলটি ছুঁইয়ে দিলেই, সেই পাতাটি সে মাথায় গলায় বারবার বুলিয়ে বলত, দিদিঠাকরুন আশীর্বাদ করো যেন এবার মরে সৎ জাত হয়ে জন্মাই, যেন হাত দিয়ে তোমার পায়ের ধুলো নিয়ে মাথায় রাখতে পারি। ঠাকুরমা সস্নেহে হেসে বলতেন, নয়ন, আমার আশীর্বাদে তুই এবার বামুন হয়ে জন্মাবি।

নয়নের চোখ সজল হয়ে উঠত, বলতো, অত আশা করিনে দিদি, পাপের আমার শেষ নেই, সে-কথা আর কেউ না জানুক তুমি জানো। তোমার কাছে কিছু গোপন করিনি।

ঠাকুরমা বলতেন, সব পাপ তোর ক্ষয় হয়ে গেছে নয়ন। তোর মত ভক্তিমান, ভগবৎ-বিশ্বাসী ক'জন সংসারে আছে! এ-পথ কখনো ছাড়িস নে রে, পরকালের ভাবনা নেই তোর।

নয়ন চোখ মুছতে মুছতে চলে যেত, ঠাকুরমা হেঁকে বলতেন, কাল দুটি প্রসাদ পেয়ে যাস নয়ন, ভুলিস নে যেন।

এ-সব আমি নিজের চোখে কতবার দেখেচি। সুতরাং যে-বৈষ্ণবের সে প্রাণপণে সেবা করে, তার হত্যায় ও যে মর্মান্তিক ক্রুদ্ধ ও বিচলিত হবে তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বললে,—নিরীহ বোষ্টম ভিক্ষে করে সন্ধ্যেবেলায় ঘরে ফিরছিল, ওর কাছে কি পাবি যে মেরে ফেললি বলতো? দু'গণ্ডা চার গণ্ডার বেশী ত নয়। ইচ্ছে করে তোদেরও এমনি ঠেঙিয়ে মারি।

এবার গাছের আড়াল থেকে জবাব এলো—দু'গণ্ডা চার গণ্ডাই বা দেয় কে রে? তোর চোদ্দ পুরুষের ভাগ্যি যে এ-যাত্রা বেঁচে গেলি। ধর্মকথা শোনাতে হবে না—পালা—পালা—

কথা তার শেষ না হতেই নয়ন যেন বাঘের মত গর্জে উঠল—বটে রে হারামজাদা! পালাবো? তোদের ভয়ে? তখন ট্যাঁক থেকে পাঁচটা টাকা বার করে এ-হাতের টাকা ঝনঝন করে ও—হাতের মুঠোয় নিয়ে বললে,—এতগুলো টাকার মায়া ছাড়িস নে বলে দিলাম। পারিস্, সবাই একসঙ্গে এসে নিয়ে যা। কিন্তু ফের সাবধান করে দিই—আমার বাবাঠাকুরের গায়ে যদি কুটোর আঁচড় লাগে ত তোদের সব ক'টাকে জন্মের মতো রাস্তায় শুইয়ে রেখে তবে ঘরে যাবো। শেত্‌লার নয়ন ছাতি আমি—আর কেউ নয়। বলি, নাম শুনেছিস্, না এমনিই লাঠি হাতে ভিখিরী মেরে বেড়াস্? হারামজাদা শিয়াল-কুকুরের বাচ্চারা!

গাছের তলা একেবারে স্তব্ধ। মিনিট-দুই স্থির থেকে নয়ন পুনরায় অধিকতর কটু সম্ভাষণে হাঁক দিলে— কি রে—আসবি, না টাকাগুলো ট্যাঁকে নিয়েই ঘরে যাবো?

কোন জবাব নেই। পথের উপরে দু-তিন গাছা পাব্‌ড়া পড়ে ছিলো, নয়ন একে একে কুড়িয়ে সেগুলো সংগ্রহ করে বললো,—চলো দাদা, এবার ঘরে যাই। রাত হয়ে এলো, তোমার ঠাকুরমা হয়ত কত ভাবছেন। ওরা সব শিয়াল-কুকুরের ছানা বৈ ত নয়, মানুষের কাছে আসবে কেন? তুমি একগাছা ছিপ-হাতে তেড়ে গেলেও সবাই ছুটে পালাবে দাদাভাই।

ইতিমধ্যেই আমার ভয় ঘুচে সাহস বেড়ে গিয়েছিল, বললাম—যাবো তেড়ে নয়নদা?

নয়ন হেসে ফেললে। বললে,—থাক্‌গে দাদা, কাজ নেই। কামড়ে দিতে পারে।

আমরা আবার পথ চলতে লাগলাম। নয়নের মুখে কথা নেই, আমার একটা প্রশ্নেরও সে হাঁ-না ছাড়া জবাব দেয় না। খানিকটা এগিয়েই একটা বড় গাছতলার অন্ধকার ছায়ায় এসে সে থমকে দাঁড়াল, বলল,—না দাদাভাই, চোখে দেখে ছেড়ে যাওয়া হবে না। বামুন-বোষ্টমের প্রাণ নেওয়ার শোধ আমি দেবো।

কি করে শোধ দেবে নয়নদা?

এক ব্যাটাকেও কি ধরতে পারবো না? তখন দু'জনে মিলে তারেও ঠেঙিয়ে মারবো।

ঠেঙিয়ে মারার আনন্দে আমি প্রায় আত্মহারা হয়ে উঠলাম। একটা নতুন ধরনের খেলার মত। ওদের সম্বন্ধে কত ভয়ঙ্কর কথাই না শুনেছিলাম; কিন্তু সব মিছে। নয়নদা যেতে দিলে না, নইলে আমিই তেড়ে গিয়ে নিশ্চয়ই একটাকে ধরে ফেলতে পারতাম! বললাম,— নয়নদা, তুমি বেশ করে এক ব্যাটাকে ধরে থেকো, আমি একাই ঠেঙিয়ে মারবো। কিন্তু আমার ছিপ যদি ভেঙ্গে যায়?

নয়ন পুনরায় হেসে বললে,—ছিপের ঘায়ে মরবে না দাদা, এই লাঠিটা নাও, বলে সে সংগৃহীত পাব্‌ড়ার একগাছা আমার হাতে দিয়ে বললে,—গরু নিয়ে এইখানে একটু দাঁড়াও দাদাভাই, আমি এখুনি দু'এক ব্যাটাকে ধরে আনচি। কিন্তু চেঁচামেচি কান্নাকাটি শুনে ভয় পেয়ো না যেন।

নাঃ ভয় কি! এই যে হাতি লাঠি রইল।

নয়ন বাকি পাব্‌ড়া দুটো বগলে চেপে ধরলে, তার বড় লাঠিটা রইল ডান হাতে, তার পরে রাস্তা ছেড়ে বনের ধার ঘেঁষে হামাগুড়ি দিয়ে ফিরে চলল সেইদিকে। ঠেঙাড়েরা ঠাউরেছিল আমরা চলে গেছি। নিশ্চিন্ত হয়ে ফিরে এসে সেই মৃত ভিখিরীর ট্যাঁক হাতড়ে, ঝুলি ঝেড়ে তারা খুঁজে দেখছিল কি আছে।

হঠাৎ একজনের চোখে পড়লো অনতিদূরে গাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে নয়ন। সভয়ে চেঁচিয়ে উঠলো—কে দাঁড়িয়ে ওখানে?

—আমি নয়ন ছাতি। অমনি দাঁড়িয়ে থাক্, ছুটে পালাবি কি মরবি।

কিন্তু, কথা শেষ না হতেই অনেকগুলো পায়ের ছুটোছুটি শুনতে পেলাম এবং প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই অস্ফুট আর্তস্বরে কেঁদে উঠে কে যেন হুড়মুড় করে একটা ঝোপের উপর পড়ে গেল।

নয়ন চেঁচিয়ে বললে— এক ব্যাটারে পেয়েছি দাদাভাই, আরগুলো পালালো।

শুভ সংবাদে সেইখানে দাঁড়িয়ে লাফাতে লাগলাম। আমি চেঁচিয়ে বললাম,—ওরে ধরে আনো নয়নদা, আমি ঠেঙিয়ে মারব। তুমি মেরে ফেলো না যেন।

—না দাদা, তুমিই মেরো।

আবার একটা করুণ ধ্বনি কানে এলো, বোধ করি নয়নের লাঠির খোঁচার ফল। মিনিট-দুই পরে দেখি একটা লোক খোঁড়াতে খোঁড়াতে আসচে, তার পিছনে নয়নচাঁদ। কাছে এসে হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠে আমার পা জড়িয়ে ধরলে। নয়ন টান মেরে তারে তুলে দাঁড় করালে। এখন তার মূর্তি দেখে আমি ভয়ে শিউরে উঠলাম। মুখে তার কালি মাখানো, তাতে সাদা সাদা চুনের ফোঁটা দেওয়া। যেমন রোগা তেমনি লম্বা, পরনে শতচ্ছিন্ন ন্যাকড়া। তখনও কাঁদছিল। তার গালে নয়ন প্রচণ্ড এক চড় মেরে বললে,—চুপ

কর্ হারামজাদা! যা জিজ্ঞাসা করি সত্যি জবাব দে। ক'জন ছিলি? তাদের কি নাম, কোথায় ঘর বল্?

লোকটা প্রথমে বলতে চায় না, কিন্তু পিঠে একটা গুঁতো খেয়ে সঙ্গীদের নাম-ধাম গড়গড় করে বলে গেল।

নয়ন বললে,—মনে থাকবে, ভুলবো না। এখন বল্, বোষ্টম ঠাকুর পড়ে গেলে নিজে তুই ক'ঘা বাড়ি দিয়েছিলি?

পাঁচ-সাত ঘা হবে বোধ হয়।

নয়নচাঁদ দাঁত কড়মড় করে বললে, আচ্ছা,—পাঁচ-সাত ঘা-ই সই। এবার ঠিক তেমনি করে শো, যেমন করে বোষ্টম ঠাকুরকে শুয়ে থাকতে দেখলাম। দাদাভাই, এগিয়ে এসো,—ঐ খেঁটে দিয়ে পাঁচ-সাত ঘায়েই সাবাড় করা চাই কিন্তু। দেখবো কেমন হাতের জোর। তুই ব্যাটা দেরি করচিস্ কেন? শুয়ে পড়—বলেই তার কান ধরে টেনে রাস্তায় বসালে। এবং নিজে সে শোবার পূর্বেই প্রচণ্ড গোটা দুই-তিন লাথি পিঠে মেরে পথের ধুলোর পরে লুটিয়ে দিলে। বললে,—দেরি করো না দাদা, মাথা তাক করে মারো। দু-তিন ঘার বেশী লাগবে না।

নয়নদার গলার স্বর গেল বদলে, চোখ-মুখ যেন আর কার। চেহারা দেখে গায়ে কাঁটা দিলে, নতুন খেলা শুরু করবো কি, ভয়ে হাত-পা কাঁপতে লাগল, কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললাম,—আমি পারবো না, নয়নদা।

পারবে না? তবে আমিই শেষ করে দিই।

না নয়নদা, না, মেরো না।

কিন্তু, লোকটা লাথি খেয়ে সেই যে শুয়ে পড়েছিল, আর নড়েচড়েনি। প্রাণভিক্ষেও চায়নি—একটা কথা পর্যন্ত না।

বললাম,—চলো, ওরে বেঁধে নিয়ে থানায় ধরিয়ে দিই গে।

শুনে নয়নদা যেন চমকে উঠল। থানায়? পুলিশের হাতে?

হাঁ। ও যেমন মানুষ মেরেছে, তারাও তেমনি ওকে ফাঁসি দিক। যেমন কর্ম তেমন ফল।

নয়ন খানিকক্ষণ চুপ করে রইল, তার পরে তারে একটা লাঠির ঠেলা দিয়ে বললে—ওরে ওঠ্।

কিন্তু কোন সাড়া নেই। নয়ন বললে, ব্যাটা মরে গেল নাকি? যে দুর্বল সিং—দু'দিন হয়ত পেটে একমুঠো অন্নও নেই—আবার পথে এসেছে লোক ঠ্যাঙাতে। যা ব্যাটা, দূর হ। উঠে ঘরকে যা।

সে কিন্তু তেমনিই রইল পড়ে। নয়ন তখন হেঁট হয়ে তার নাকে হাত দিয়ে বললে, না মরেনি। অজ্ঞান হয়ে আছে। জ্ঞান হলে আপনিই ঘরে যাবে। চল দাদা, আমরাও ঘরে যাই। অনেক দেরি হয়ে গেল, ঠাকুরমা ভাবচে।

পথে যেতে যেতে বললাম, কেন ছেড়ে দিলে নয়নদা, পুলিশে ধরিয়ে দিলে বেশ হতো।

কেন দাদাভাই?

বেশ ফাঁসি হয়ে যেত। খুন করলে ফাঁসি হয় আমাদের পড়ার বইয়ে লেখা আছে।

আছে নাকি দাদা?

আছে বৈ কি। চলো না বাড়ি গিয়ে তোমাকে বই খুলে দেখিয়ে দেব।

নয়ন বিস্ময়ের ভান করে বললে, বলো কি দাদা, একটা মানুষ মারার বদলে আর একটা মানুষ মারা?

হাঁ, তাই ত। সেই ত তার উচিত সাজা। আমরা পড়েছি যে!

নয়ন একটুখানি হেসে বললে,—কিন্তু, সব উচিতই যে সংসারে হয় না, দাদাভাই।

কেন হয় না নয়নদা?

নয়ন হঠাৎ জবাব দিলে না, একটু ভেবে বললে,—বোধ হয় জগতে সবাই ধরিয়ে দিতে পারে না বলে।

কেন যে পারে না, কেন যে মানুষে এ অন্যায় করে, সে তত্ত্ব সেদিনও জানিনি, আজও না। তবু, এই কথাটাই ভাবতে ভাবতে খানিকটা পথ চলার পরে জিজ্ঞাসা করলাম,—আচ্ছা নয়নদা, ওরা ফিরে গিয়ে আবার ত মানুষ মারবে?

নয়ন বললে, না দাদা, আর মারবে না! আমি বেঁচে থাকতে এ কাজ ওরা আর কখনো করবে না।

জবাবটায় বেশ প্রসন্ন হতে পারলাম না। ফাঁসি হওয়াই ছিল আমার মনঃপূত। বললাম,—কিন্তু ওরা বেঁচে ত গেল। শাস্তি ত হলো না।

নয়ন অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবছিল, বললে,—কি জানি,—হবে হয়ত একদিন। পরক্ষণে সচেতন হয়ে বললে,—আমি ত এর উত্তর জানিনে দাদাভাই, তোমার ঠাকুরমা জানেন। তুমি বড় হলে তাঁকে একদিন জিজ্ঞেসা করো।

আমার কিন্তু বড় হবার সবুর সইল না, বাড়িতে পা দিয়েই সমস্ত বিবরণ, শুধু হাত-পা কাঁপার অবান্তর কথাগুলো বাদ দিয়ে—অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের যথোচিত সঞ্চালনে আমাদের ঠাঙাড়ে-বিজয় কাহিনী বর্ণনা করে ঠাকুরমাকে সবিস্তারে বুঝিয়ে দিলাম—গরু কিনতে গিয়ে আজ কি কাণ্ড ঘটেছিল। আগাগোড়া মন দিয়ে শুনে তিনি কেবল একটা নিঃশ্বাস ফেলে আমাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন।

নয়ন এতক্ষণ চুপ করে শুনছিল। আমার বলা শেষ হতে টাকা-পাঁচটি ঠাকুরমার পায়ের কাছে রেখে বললে,—গরুটা এমনিই পেলাম। তোমার টাকা তোমার কাছেই ফিরে এল দিদি। না নিলেন পিসীমা, না নিলে তোমার মেজবৌয়ের ভাইদের দল পথে।

ঠাকুরমা একটু হেসে বললেন, দেখা হলে মেজবৌকে জানাব। কিন্তু ও টাকা আমিও নেবো না নয়ন। ও তোর ঠাকুরের ভোগে লাগাগে যা। কিন্তু একটা কথা আজ তোকে বলি নয়ন, এখনো তেমন বোষ্টম হতে তুই পারলি নে।

কেন দিদি?

তারা কি টাকা বাজিয়ে লোক ভোলায়? ধর্ যদি লোভ সামলাতে না পেরে ছুটেই আসত?

তাহলে আরও গোটা পাঁচ-ছয় মরত। তাতে নয়নের পাপের ভরায় কতটুকুই বা ভার চাপত, দিদি?

ঠাকুরমা চুপ করে রইলেন। এ ইঙ্গিতের অর্থ জানেন তিনি, আর জানে নয়ন নিজে। কিন্তু সেও আর কিছু বললে না। দূর থেকে তাঁকে ভূমিষ্ঠ প্রণাম করে টাকা-পাঁচটি মাথায় ঠেকিয়ে নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।